গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৯ এপ্রিল, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

জনগণের দুই চরম শত্রু বিজেপি ও কংগ্রেস এবং অন্যান্য সুবিধাবাদীদের পরাস্ত করুন

দেশবাসী কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছেন। এখনই ভোট করলে ভোটদাতা জনসাধারণের ক্ষোভ ততটা তীব্র হবে না, সাম্প্রতিক ৩টি রাজ্যের (রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ) নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বর্তমান ত্রয়োদশ লোকসভা মেয়াদ শেষ হওয়ার ৮ মাস আগেই ভেঙে দিয়েছে। এরই ফলে আগামী ২০ এপ্রিল থেকে চতুর্দশ লোকসভা গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একই সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা এবং সিকিম বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার হেতু অথবা জনসাধারণের বিশেষ দাবির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের আগে লোকসভা বা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নজির থাকলেও এইভাবে সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে ভোটদাতা জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ঘটিয়ে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক নজির খুব বেশি নেই। একই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা গেল যে, এদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতি আজ এমন জায়গায় অধঃপতিত হয়েছে যে পরীক্ষার ভরা মরশুমে নির্বাচন করার প্রস্তাব করতেও এদের আটকাল না।

নির্বাচন হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন সমগ্র দেশ এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত

স্পষ্টতই চতুর্দশ লোকসভার এই নির্বাচন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন সমগ্র দেশেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত অস্থির সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আমাদের দেশ স্পষ্টত ধনী ও গরিবে বিভক্ত। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসকে সামনে রেখে দেশের ধনিকশ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ত করে। এর ফলে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, দ্রুত তা নিম্নগামী হতে শুরু করে। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে। অন্যদিকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দ্রুত বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগে ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে অবাধ অর্থনৈতিক বিকাশের পথ পুঁজিপতিদের সামনে খোলা ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখা গিয়েছে তার প্রায় সমস্ত সুফলই পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের সহযোগীদের হাতে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করেছে। নতুন করে প্রবর্তিত পুঁজিবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণামে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের আর্থিক অবস্থান নিম্নাভিমুখী হতে শুরু করেছে। মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা ক্রমশ প্রকট হতে শুরু করেছে। জীবিকা নির্বাহের ব্যয় দ্রুত গতিতে বেড়েছে, অথচ ৮৫-৯০ ভাগ মানুষের প্রকৃত আয়বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়নি। এর ফলে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের ঋণগ্রস্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্য তীব্র

তিনের পাতায় দেখুন

সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে

চীনে প্রতিবিপ্লব সম্পূর্ণ

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, ১১-১৪ অক্টোবর ২০০৩ অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্লেনারি অধিবেশন যে সুপারিশ করেছিল, তারই ভিত্তিতে গত ১৪ মার্চ ২০০৪ চীনের দশম জাতীয় গণ কংগ্রেসে চীনের সংবিধানে কতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। এই সংশোধনীগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনা করে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার (এস ইউ সি আই) কেন্দ্রীয় কমিটি গত ১৮ এবং ১৯ মার্চ ২০০৪ অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, চীনের সংবিধানের এই সংশোধনীগুলির পরিণামে ঃ

— ব্যক্তিগত ও বেসরকারি ব্যবসা সহ অ-রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (non-public economy) আইনসম্মত অধিকার ও স্বার্থসমূহ রাষ্ট্র রক্ষা করবে। অ-রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিকাশে রাষ্ট্র উৎসাহ ও সমর্থন দেবে এবং গাইড করবে।

— নাগরিকদের আইনসম্মতভাবে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিমালিকানার অধিকার এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে মালিকানার অধিকার রাষ্ট্র আইনের দ্বারা রক্ষা করবে। রাষ্ট্র জনস্বার্থে ব্যক্তিমালিকের জমি দখল করতে পারবে, অথবা জনগণের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবে। একথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সংশোধনীর ফলে একজন নাগরিক মালিকানার অধিকার ছাড়াও ব্যক্তিসম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য অধিকার, যথা সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার, ব্যবহারের অধিকার ও মুনাফা করার অধিকারও ভোগ করবেন।

বেসরকারি ক্ষেত্র — যার নতুন নাম দেওয়া হয়েছে অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র — সে সম্পর্কে গৃহীত সংশোধনীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ব্যক্তি মালিকানাধীন (অথবা যৌথ মালিকানাধীন) প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (enterprises run by private citizens) ছাড়াও চীন-বৈদেশিক যৌথ উদ্যোগ, কো-অপারেটিভ ব্যবসা ও সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে পড়বে। একথাও বলা হয়েছে যে, সংস্কার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে 'খোলা দরজা' নীতি গ্রহণ করার পর থেকে, রাষ্ট্র ক্রমেই সামাজিক বিকাশে বেসরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা হবে 'রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অনুপূরক' বলে ১৯৮৮ সালের প্রথম সংশোধনীতে যে কথা বলা হয়েছিল, ১৯৯১ সালের সংশোধনীতে তা পরিবর্তন করে বলা হয়, বেসরকারি ক্ষেত্র হচ্ছে "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আবশ্যিক অংশ।" বর্তমান সংশোধনীর পর রাষ্ট্রের নীতিই হয়ে দাঁড়াল বেসরকারি ক্ষেত্রের বিকাশে সাহায্য করা।

চারের পাতায় দেখুন

'জীবনশৈলী শিক্ষা' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ ভারতসভা হলে নাগরিক কনভেনশন। (সংবাদ ২ পাতায়)

সি পি এম-পুলিশ যৌথ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কুলতলি থানা ঘেরাও

দীর্ঘদিন যাবৎ কুলতলি থানা এলাকায় পুলিশ ও সি পি এম যৌথ সন্ত্রাস চালিয়ে দীর্ঘদিনের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা এস ইউ সি আই'র শক্তঘাঁটি ভাঙার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

একের পর এক খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি চালিয়ে এবং এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থক সহ সি পি এম বিরোধী সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি মদতে আক্রমণ চালিয়ে সিপিএম-সমাজবিরোধীরা বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুলতলি থানার ওসি জয়দীপ ব্যানার্জী একজন 'সাচ্চা' সি পি এম নেতার মত সমগ্র থানা এলাকায় সি পি এম নেতাদের নিয়ে বৈঠক করা এবং এস ইউ সি আই'র উপর আক্রমণের ছক তৈরিতে মদত দিয়ে আসছে। সাধারণ মানুষ থানায় গেলে ডায়েরি নেওয়া হয় না। সি পি এম-এর নির্দেশে বিরোধী দলের সমর্থকদের বিনা কারণে ৪-৫ দিন থানায় আটকে রেখে অবশেষে যেকোন মিথ্যা মামলায় যুক্ত করে কোর্টে চালান করে দেওয়া হচ্ছে। এই থানার কোন কোন অফিসার থানার মোটর বাইকে সি পি এম নেতাদের নিয়ে এলাকা প্রদক্ষিণ করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। আর এসবই ঘটছে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর প্রত্যক্ষ মদতে।

বার বার পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে স্থানীয় বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত প্রতিবিধানের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই অবস্থার অবসানকল্পে গত ১ এপ্রিল এস ইউ সি আই'র পক্ষ থেকে কুলতলি থানা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। পুলিশ ও সি পি এম-এর দীর্ঘদিনের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দশ সহস্রাধিক মানুষ কুলতলি থানা অভিযানে সামিল হন। জনতার দাবি ছিল, সি পি এম-এর আজ্ঞাবহ ওসি জয়দীপ ব্যানার্জীর সঙ্গে কোন আলোচনা করা হবে না। বিক্ষুব্ধ জনতার এই মনোভাব জেনে এস ডি পি ও এবং সি-আই থানায় উপস্থিত থেকে বিক্ষুব্ধ জনতার পক্ষে স্থানীয় বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, লোকসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী অধ্যাপক তরুণ নস্কর, কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার সহ ১২ জন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বাইরে থানা ঘেরাও করে রাখে বিশাল জনতা।

এস ইউ সি আই প্রতিনিধিরা এস ডি পি ও এবং সি আই-এর সামনে তথ্য প্রমাণ সহ ওসি জয়দীপ ব্যানার্জীর অপরাধের তালিকা পেশ করলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যেই ওসি এবং অন্যান্য অফিসারদের তীব্র সমালোচনা করতে বাধ্য হন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন।

এই বিক্ষোভ ও থানা ঘেরাও-এর কর্মসূচির সাফল্যে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এম এস এস-এর উদ্যোগে 'জীবনশৈলী শিক্ষা' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

নাগরিক কনভেনশন

সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অষ্টম শ্রেণী থেকে 'জীবনশৈলী শিক্ষা'র নামে যে যৌনশিক্ষা চালু করার প্রস্তাব করেছে তার প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ৩০ মার্চ ভারতসভা হলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী।

এডস্-এর আক্রমণ রোখার যুক্তি তুলে, মূল্যবোধের প্রশ্ন উহ্য রেখে অপরিণত কিশোর-কিশোরীদের জন্য যৌন শিক্ষাক্রম চালু করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিমূলক সরকারি প্রস্তাবকে তীব্র সমালোচনা করে সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই শাসক দল শিক্ষাব্যবস্থার উপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে যাতে যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, সেই শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই বাধা সৃষ্টি হয়। এই উদ্দেশ্যেই এই ধরনের যৌন শিক্ষার পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

সেই কারণে গভীর উদ্বেগের সাথে উক্ত প্রস্তাবে অশ্লীলতা ও মাদক প্রসার রোধের দাবি সহ দাবি করা হয় যে, অবিলম্বে প্রস্তাবিত যৌনশিক্ষার পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। বলা হয়, যৌনশিক্ষা যদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানী-শিক্ষাবিদ-চিকিৎসকদের দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপযুক্ত বয়স নির্বাচন, পাঠক্রম প্রণয়ন ও পরিকাঠামো গঠন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত বয়সের যোগ্য শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কনভেনশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড কৃষ্ণা সেন। প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড প্রতিমা সিরাজ।

ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী কাজল সরকার বলেন, অষ্টম শ্রেণীর একটা ছেলে বা মেয়ে না বুঝে না জেনে সরকারের দেওয়া যৌনশিক্ষার ওপর বই পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। তার ফল কী মারাত্মক হবে সে সম্পর্কে আজই আমাদের ভাবা উচিত। শিক্ষকরাও কি এগুলো পড়াতে বোঝাতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন? জনগণের প্রতি যদি সত্যিই আমরা দরদী হই, তাহলে স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতি করা উচিত। যৌনশিক্ষা যদি এডস্-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে তাহলে পাশ্চাত্য দেশে যেখানে স্কুলে যৌনশিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে এডস্-এর প্রভাব বেশি কেন? সেইসব দেশে বিকৃতরুচির প্রভাব এতো বেশি কেন? সেইসব দেশ থেকেই যৌনরোগ এখানে এসেছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সরকারি যৌনশিক্ষা পাঠক্রমের বিরুদ্ধতা করেন।

সমাজসেবী শ্রীমতী কেশোয়ার জাঁহা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক আরতি বসু সেনগুপ্ত হাতেকলমে সামাজিক কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং যৌনজীবনের অজ্ঞতা ও বিকৃতির কারণে দেখা দেওয়া সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কনভেনশনে প্রস্তাব সমর্থন করে শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তপন রায়চৌধুরী বলেন, মানুষের যৌনতা আর পশুর যৌনতা এক নয়। মানুষের যৌনতার সঙ্গে রয়েছে মনস্তত্ত্বের গভীর সম্পর্ক। সমাজে যখন মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটছে, পারিবারিক সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে, ছাত্রযুবকরা উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া জীবনের দিকে ছুটছে তখন এই যৌনশিক্ষার পরিণতি কি দাঁড়াবে তা ভেবে অভিভাবকরা আতঙ্কিত। শিক্ষার নামে অপরিণত কিশোর-কিশোরীদের এইভাবে খোলাখুলি যৌন বিষয় নিয়ে চর্চা করতে সরকার উৎসাহিত করছে কেন? একদিকে মদের ঢালাও প্রসার, অন্যদিকে যৌনশিক্ষা সবকিছুর পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছাত্রযুবদের নৈতিক মেরুদণ্ড পুরোপুরি এমনভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যাতে তারা কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না, এক মনুষ্যত্ব বিবর্জিত জীবে পরিণত হবে, যাদের সহজেই পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যেকোন অনৈতিক কাজ করানো যাবে — এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার। সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক বক্তব্য নিয়ে গিয়ে অবিলম্বে আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করা দরকার।

ডাক্তার অশোক সামন্ত প্রস্তাব সমর্থন করে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন — আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের বহু দেশে দীর্ঘদিন থেকে যৌনশিক্ষা চালু আছে। কাউনসেলিং চালু আছে। কিন্তু আজও আমেরিকা যৌনশিক্ষার উপর একটা জাতীয় পলিসি ঠিক করতে পারেনি। আমেরিকার ছাত্ররা আজ স্কুলের মধ্যে শিক্ষিকাদের 'রেপ' করছে, মার্ডার করছে। এ নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। ১৪-১৭ বছরের ৪০% কিশোরী গর্ভবতী হচ্ছে। প্রতি বছর ১০ লক্ষ কুমারী মা হচ্ছে। গর্ভপাতের হার ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে। যৌনশিক্ষা কি সে দেশকে রক্ষা করতে পারছে?

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন — এডস্-কে রোখার নাম করে অষ্টম শ্রেণী থেকে যে যৌনশিক্ষা চালু করার প্রয়াস চলেছে তাতে ভাব দেখানো হচ্ছে যে ছুঁৎমার্গের কোনও দরকার নেই। এভাবে যৌনজীবনে নৈতিকতার বাঁধনকে আলগা করার চেষ্টা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে যেভাবে যৌনশিক্ষা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা তার পুরোপুরি বিরোধী। ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে কার ভালোর জন্যে? জায়গায় জায়গায় সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভ্যালেনটাইন ডে'র প্রচার করা হচ্ছে। সব কিছুর সঙ্গেই এই যৌনশিক্ষা যুক্ত। আসলে এ-হল মানুষকে জানোয়ারে পরিণত করার চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা দরকার। হাজার হাজার সই সংগ্রহ করা দরকার সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য।

কনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও অন্যান্য স্তরের বিশিষ্ট নাগরিক ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা উত্থাপিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।

শহীদ ভগৎ সিং দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩ মার্চ শহীদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং-এর ৭৪তম ফাঁসির দিনে দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন হলে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভাস রায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। আলোচনা করেন অধ্যাপক তরুণ নস্কর, শহীদ যতীন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মিলন দাস ও সত্যেন চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সভার শেষে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবোধ রঞ্জন সেনকে সভাপতি এবং এস রায় চৌধুরী ও অংশুমান রায়কে যুগ্মসম্পাদক করে, শহীদ যতীন দাস জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের কর্মশালা

২৮ মার্চ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা হলে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কন্‌জিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিদ্যুৎগ্রাহকদের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আইনগত, প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক বিষয়গুলির উপর প্রশ্নাবলী নিয়ে এই কর্মশালায় নানা দিক থেকে আলোচনা করেন খ্যাতনামা বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুজয় বসু, অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতি।

রিক্সা ও ভ্যান চালকদের ডেপুটেশন

কলকাতা দক্ষিণ শহরতলি রিক্সা ও ভ্যানচালক ইউনিয়ন ২৯ মার্চ বেহালার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৪ নং বরো চেয়ারম্যান-এর কাছে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশনের দাবিতে ডেপুটেশন দেয়। কর্পোরেশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি বিজন হাজরা, সহসভাপতি কুমার চৌধুরী এবং অর্জুন ঘোষ, জয়দেব রানা, উপেন মণ্ডল প্রমুখ।

চা-ফ্যাক্টরি খোলার দাবিতে গণঅবস্থান

শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ী এলাকার ছোবাভিটা চা-ফ্যাক্টরি প্রায় ১ মাস ধরে বন্ধ। সেখানকার শ্রমিকরা আন্দোলনরত। অবিলম্বে বিনাশর্তে ফ্যাক্টরি খোলার দাবিতে গত ২৬ মার্চ ফুলবাড়ীতে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থান সংগঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ঐ বাগানে চা-শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠিত করতে গিয়ে বাগান মালিকদের চক্রান্তে শ্রমিকনেতা কমরেড তন্ময় মুখার্জী খুন হন। অবস্থানে কমরেড তন্ময় মুখার্জীর খুনীদের শাস্তির দাবিও তোলা হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড জ্যোৎস্না রায়, কমরেড ভাস্কর রায়, কমরেড হরিশঙ্কর বর্মন, কমরেড আবু কাসেম প্রমুখ।

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

একের পাতার পর

আকারে দেখা দিতে শুরু করেছে। এই পথেই সাধারণ মানুষ যার যা সম্বল ছিল তা হারাতে শুরু করেছেন। এইভাবেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অস্তিত্ব হারিয়েছেন এবং তাদের অনেকেই দিনমজুরে পর্যবসিত হয়েছেন। গ্রামাঞ্চলেও এই দুঃসহ অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে পড়ে অভাবে বা ঋণভারে জর্জরিত সাধারণ কৃষকরা বাধ্য হয়ে জমি হয় বন্ধক রেখেছেন, নয়ত জলের দরে বিক্রি করে সর্বহারা কৃষি-মজুরে পরিণত হয়েছেন এবং এরই পাশাপাশি মুষ্টিমেয় ধনী কৃষক-মহাজন নামে-বেনামে বহু জমির মালিক হয়ে উঠেছে। গ্রামে জীবিকা নির্বাহের কোন পথ খোলা না পেয়ে ভূমিহীন কৃষকরা দিনমজুরির আশায় শহরের দিকে ছুটেছেন এবং আজও ছুটছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবিকা নির্বাহের পথ সেখানেও বন্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে শিল্পক্ষেত্রে মূলত সরকার পরিচালিত শিল্পোদ্যোগে এখানে সেখানে কিছু কলকারখানা গড়ে উঠলেও, ব্যাপক অবাধ শিল্পোন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হয়নি। পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগে পুঁজিবাদের তৃতীয় সাধারণ সর্বাত্মক সংকটের ফলে এ কাজ স্বাভাবিক কারণে ব্যাহত হয়েছে। দেশের সর্বত্র পুরনো কলকারখানাগুলিও স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই সঙ্কটের আবর্তে পড়েছে। বেসরকারি শিল্প উদ্যোগে ধীরে ধীরে ছাঁটাই, লকআউট, লে-অফ বেড়েছে। শেষপর্যন্ত কলকারখানাগুলি একটার পর একটা বন্ধ হতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৫৭ বছরে একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বল্গাহীন মূল্যবৃদ্ধির দাপট চলেছে, অন্যদিকে শহরে-গ্রামে সর্বত্র কোটি কোটি কর্মহীন এবং কর্মচ্যুত মানুষের চাপ বিস্ফোরক আকার ধারণ করেছে। এইসবের ফলে জনজীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার শেষবিন্দুটুকুও আজ অন্তর্হিত। একটা ভয়াবহ শূন্যতাবোধ সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাকেই বহু আগেই নিরর্থক করে তুলেছে। অপরদিকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারগুলির উন্নয়নের ফিরিস্তি এবং মনমোহিনী প্রচারের জোয়ার বইছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এই কাজেই নিয়োজিত রয়েছে। এই মিথ্যা প্রচারের আপাতজোর এমনই যে এইভাবেই জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ বা প্রকৃত দারিদ্র্যসীমার তলায় বসবাসকারী প্রায় ৭০ ভাগ মানুষের দীর্ঘশ্বাস এবং তাদের ক্রন্দন অতি সহজে চাপা পড়ছে। জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজনটুকু অন্তত সুনিশ্চিত রয়েছে এবং জীবনধারণের আর একটি অপরিহার্য দিক — প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ সজাগ এবং সক্রিয় রয়েছে — এভাবে ক'জন মানুষ জীবননির্বাহ করতে পারছেন? এঁদের সংখ্যা তো আমরা হাতে গুণতে পারি। বাকি সকলের কাছেই জীবনধারণ নিরর্থক অসহনীয় বোঝা, বিড়ম্বনা। একদল 'বেঁচে থেকে লাভ কী', 'মরলেই ভাল', 'মরলেই শান্তি', 'মরছি না কেন' — এই বলে বুক চাপড়াচ্ছেন এবং জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছেন। অসহায় পিতা খেতে দিতে না পেরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিজ হাতে হত্যা করে আত্মহত্যা করছেন। অসহায় মাতা নিজ হাতে সন্তানসন্ততিকে হত্যা করে নিজেকে শেষ করছেন, আর না হলে শেষ করার কথা ভাবছেন। আরেক দল মনুষ্যত্বের শেষটুকু হারিয়ে জঘন্য ব্যক্তিস্বার্থের শিকার হয়ে কার্যত অধম ইতর প্রাণীতে পর্যবসিত হচ্ছেন। বাঁচার তাগিদে সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যেই রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছেন। অ-নৈতিক জীবনধারণ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন না পেয়ে নারীজাতি তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁদের নারীত্ব, তাঁদের ইজ্জত বিক্রির জন্য শ'য়ে শ'য়ে নয়, হাজারে হাজারে পথে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এই হচ্ছে আজকের দেশের সঠিক বাস্তব চিত্র। দেখবার চোখ, দেখবার মন যাদের রয়েছে তারা এই চিত্র না দেখে পারেন না। বাইরের ঠাটবাট তাদের দৃষ্টিকে ঝলসে দিতে পারে না।

বিশ্বায়নের আক্রমণকে আড়াল করতে চলেছে 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর মিথ্যা প্রচার

এই সর্বনাশা দুঃসহ পরিস্থিতিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে নেমে এসেছে 'বিশ্বায়ন নামক আর এক আঘাত। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিশ্বের বাজারে ঢোকার এবং মুনাফা অর্জনের স্বার্থে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে দেশে বিদেশি পুঁজি, বিদেশি পণ্য হু হু করে ঢুকছে এবং এরই পরিণামে টিকে থাকা কলকারখানাগুলো আরো দ্রুত বন্ধ হচ্ছে। কুটির শিল্পের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সরকার পরিচালিত শিল্পোদ্যোগের বড় বড় কলকারখানাগুলি দেশি কিংবা বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে কম দামে বেচে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি এবং আধা-সরকারি শিল্পোদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠান, যেগুলিকে বন্ধ করা যাচ্ছে না, সেখানেও শ্রমিক-কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হচ্ছে, শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না এবং পদ বিলোপ করা হচ্ছে। এসবের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই আরও দ্রুত বাড়ছে। গ্রামীণ জীবনেও এই তথাকথিত বিশ্বায়নের সর্বনাশা পরিণাম বর্তাচ্ছে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম প্রতিনিয়ত আকাশচুম্বী হচ্ছে, অন্যদিকে পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজিতে সকল কৃষিজাত দ্রব্যের দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছে। অসহায় কৃষক জনসাধারণ চোখে অন্ধকার দেখছেন এবং বাঁচার কোন পথ না পেয়ে গলায় দড়ি দিচ্ছেন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে — যেভাবে তীব্রতার সাথে এই তথাকথিত বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতি কার্যকরী হচ্ছে — তার ফলে একটি স্বাধীন সার্বভৌম, স্বাবলম্বী দেশ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং স্বাধীনচেতা মানুষরা দেখেছিলেন চোখের সামনেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

এরই পাশাপাশি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের যোগসাজসে সর্বস্তরে দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কোটি কোটি টাকার অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারীর ন্যক্কারজনক ঘটনা প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে। জনসাধারণেরই অমানুষিক পরিশ্রমে সৃষ্ট সম্পদ নিয়ে এই ধরনের ছিনিমিনি খেলা অপ্রতিহতভাবে চলছে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, গোটা অর্থনীতি যখন তীব্র বাজার সঙ্কটের ফলে এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে, যখন উৎপাদনে সামান্যতম তেজীভাবও কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না, ছাঁটাই ও বেকারসমস্যা তীব্রভাবে বেড়ে চলেছে, তখন এই সত্যটিকেই চাপা দেওয়ার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র মারফৎ অন্তহীন মিথ্যাপ্রচার চলছে। 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর গ্ল্যামার ছড়িয়ে বিজেপি সরকার তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

জনগণ নয় — কালো টাকা, মিথ্যা প্রচার ও ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীই এখন ভোটের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করছে

এই চূড়ান্ত অস্থির, অসহনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক জীবনেও ঘটছে। তাই সুদীর্ঘ ৫৭ বছরে শোষণ, অভাব এবং দারিদ্র্য দেশের জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগ মানুষকে যে মৃতবৎ করে তুলেছে, স্পষ্টতই তাকে প্রতিহত করার মতো কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাই জনসাধারণের হাতে নেই। তৎসত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে ক'টি গণতান্ত্রিক অধিকার শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীকে সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল — দেখা যাচ্ছে শোষিত জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ আন্দোলনের সামনে পড়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর সরকারগুলি ক্রমশ সেগুলিকে সঙ্কুচিত করছে। একটার পর একটা মারাত্মক ধরনের কালা আইন প্রণয়ন করে সেগুলি কেড়ে নিচ্ছে এবং এইভাবেই রাষ্ট্র, সরকার, আমলা এবং পুলিশের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার সাথে সাথে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতারও কেন্দ্রীকরণ ঘটাচ্ছে। দৃশ্যত রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে জনসাধারণের হাতে নামেমাত্র পাঁচবছর অন্তর বিধানসভা-লোকসভার ভোটে অংশগ্রহণ করার অধিকারটাই টিকে আছে। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের আজ আর সত্যিকারের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা কাজ করছে না। তীব্র হতাশা এবং ক্ষোভ এবং ভোটের দ্বারা তাদের অবস্থার কোন তারতম্য হবে না — এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই জনসাধারণ ভোট দিতে যাচ্ছেন। কারণ ভোটের বিকল্প যথার্থ বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা এবং তার উপযুক্ত সংগঠন তাদের মধ্যে আজও গড়ে ওঠেনি। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি পুঁজিপতিদের কোটি কোটি কালো টাকা নিয়ে নির্বাচনে নামছে। টাকার এই লেনদেন আগে গোপনে হলেও আজ তা গোপনে ও প্রকাশ্যে দু'ভাবেই হচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে এরা নির্বাচনে নামছে এবং এগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পক্ষে কৃত্রিম জনমত গড়ে তোলার জন্য এরা চেষ্টার কোন ফাঁক রাখছে না। একইসঙ্গে জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিচ্ছে। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকছে না। যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য তারা ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপি থেকে শুরু করে সন্ত্রাস, ভীতিপ্রদর্শন, বুথ দখল — কোন কিছু করতেই ইতস্তত করছে না। আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, আমলা-পুলিশকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসকদলগুলি নির্বিবাদে এই কাজই বছরের পর বছর করে চলেছে। এইভাবে গোটা ভোট ব্যবস্থাটাই আজ তার গণতান্ত্রিক মর্যাদা হারিয়ে, তার মতবাদিক আদানপ্রদানের ঐতিহ্য হারিয়ে একটি নিছক দেওয়া-নেওয়ার আখড়ায়, একটি নিকৃষ্ট ব্যবসায় ও প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে নির্বাচনে প্রকাশ্যেই পুঁজিপতিশ্রেণীর টাকার বন্যা বইছে। এ যেন কে কাকে কিনতে পারে তারই প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কাজ হাসিল করতে গিয়ে এরা ছাত্র এবং যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে, তাদের বিবেককে হত্যা করছে। একইসঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছে, এইসব কিছু করেও কোন একটি শাসকদল তীব্র জনরোষের সামনে পড়ে শেষপর্যন্ত যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়ও, তথাপি তার পরিবর্তে পুঁজিপতিশ্রেণীরই আর একটি দল ক্ষমতায় বসছে। এই দ্বিদলীয় পরিষদীয় রাজনীতি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পুঁজিপতিশ্রেণীর আর একটা চালাকি মাত্র। এর ফলে সরকারের পরিবর্তন হলেও জনবিরোধী নীতিগুলি অক্ষুণ্ণ থাকছে এবং জনসাধারণ আরও অধিক শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছেন। নীতি নয়, আদর্শ নয়, তর্ক নয়, বিতর্ক নয়, বিচার নয়, বিবেচনা নয়, প্রার্থীদের ব্যক্তিগত দোষগুণ, চরিত্র, ক্ষমতা — কোন কিছুই আজ আর নির্বাচনে প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। আজকের নির্বাচনে জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদ, পুঁজিপতিশ্রেণীর কোটি কোটি কালো টাকা, ঢালাও মিথ্যাপ্রচার, ভাড়াটিয়া সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী — এরাই নিয়ামক।

কিন্তু এটা করেই পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের তাঁবেদার সরকারগুলি ক্ষান্ত থাকছে না। নির্বাচনের আইনকানুনগুলি এবং প্রার্থী হওয়ার শর্তাবলী এমনভাবে পরিবর্তন করছে, যার ফলে জনসংখ্যার ৮৫-৯০ ভাগ মানুষের এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলের এই নির্বাচনে প্রবেশাধিকারটাই না থাকে। স্পষ্টতই এই উদ্দেশ্যে নির্বাচনে জামানতের টাকার পরিমাণ ইতিমধ্যেই ২০০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তা আবার তার থেকেও দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এইভাবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে একদিকে কোটিপতি পুঁজিপতি এবং তাদেরই বশংবদরা বিধানসভা-লোকসভায় যাচ্ছে, আর অপরদিকে তাদেরই আশ্রয়পুষ্ট দাগী অপরাধীরা যারা আগে নির্বাচন জিততে পুঁজিবাদী দলগুলিকে সাহায্য করত তারা অবাধে এই নির্বাচন প্রহসনের মধ্য দিয়ে বিধানসভা লোকসভায় ঢুকছে এবং এমনকী মন্ত্রীও বনে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে সৎ, চিন্তাশীল মানুষেরা এইসব দেখে আঁৎকে উঠছেন। কাদের স্বার্থে, কাদের প্ররোচনায় এইসব ঘটনা ঘটছে তা বুঝতে না পেরে, রাজনীতি মানেই এরকম — এই ধারণারই তাঁরা শিকার হচ্ছেন এবং সমস্তরকম রাজনীতি, রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং এমনকী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখছেন। বলা বাহুল্য, এর পরিণামে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতি এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন প্রতিহত করা আরও দুরূহ হয়ে উঠছে। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছেন, এইভাবেই সমগ্র দেশে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদতে চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ-মাফিয়া-অপরাধীদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বিধানসভা-লোকসভা — এগুলি এদেরই অঙ্গুলিনির্দেশে চলছে। এগুলি এদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এইভাবে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় টিঁকে থাকার জন্য

পাঁচের পাতায় দেখুন

চীনে প্রতিবিপ্লব সম্পূর্ণ

একের পাতার পর

দ্বিতীয় বড় সংশোধনী আনা হয়েছে সংবিধানে 'তিন প্রতিনিধিত্বে'র (Three Represents) তত্ত্ব যুক্ত করার দ্বারা।

এই তথাকথিত তত্ত্বটিকে ভাষার ছদ্ম আবরণে আনা হয়েছে। প্রত্যেকেই জানেন যে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দরজা বিধিসম্মতভাবে (formally) পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দেওয়া, যাতে তারা পার্টির সদস্যপদ পেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই সংশোধনীগুলি ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেসে গ্রহণ করার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠদশ কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারপর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানে একথা ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যেকোন চীনা শ্রমিক, চাষী, সেনাবাহিনীর সদস্য, বুদ্ধিজীবী অথবা সমাজের অন্যান্য স্তরের অগ্রসর (advanced) যেকোন ব্যক্তি, যদি তাঁর বয়স ১৮ বছর হয়, এবং যদি তিনি পার্টির কর্মসূচি ও সংবিধানকে মান্য করেন এবং পার্টিতে যোগ দিতে এবং পার্টির যেকোন সংগঠনে যুক্ত থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে, পার্টির সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে ও নিয়মিত সদস্য চাঁদা দিতে রাজি থাকেন, তাহলে তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি এক্ষেত্রে আরও লক্ষ্য করছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা, যা এতদিন পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে পথনির্দেশক আদর্শ (guiding ideology) এবং জীবন পরিচালনার দর্শন (governing philosophy) হিসাবে গ্রহণ করা প্রাথমিক শর্ত ছিল, তাকেই এখন প্রকাশ্যে বর্জন করা হল।

চীনের সংবিধানের মুখবন্ধে 'সমাজতন্ত্রের নির্মাণকারীরা' (builders of the socialist cause) শব্দগুলির পাশাপাশি সংবিধানে 'তিন প্রতিনিধিত্বে'র (Three Represents) তথাকথিত তত্ত্ব যুক্ত করার পর যখন ব্যাখ্যা করে বলা হল যে, এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, বেসরকারি উদ্যোগপতি ও ব্যক্তিমালিকদের বিরুদ্ধে প্রচলিত যে প্রতিকূল মানসিকতা (prejudices) সমাজে রয়েছে তা দূর করা, তখন একথা খোলাখুলি পরিষ্কার যে, নবোদিত পুঁজিপতিশ্রেণী পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথাকথিত মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র যা পুঁজিবাদী শাসকরা রচনা করেছে এবং যার দ্বৈত উদ্দেশ্য হচ্ছে, একদিকে মালিকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করা, অন্যদিকে গালভরা, শূন্যগর্ভ ও প্রতারণামূলক শব্দের দ্বারা জনগণকে ঠকানো, তাকে এতকাল কমিউনিস্টরা, বিশেষত প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কখনই কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজে অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচনাই করেনি। বিস্ময়ের কথা যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতিত নেতৃত্ব এবার সেই মানবাধিকারের ঘোষণাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত মনে করেছেন।

এইভাবে তৃতীয় সংশোধনীর দ্বারা মানবাধিকারের বিধানগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র মানবাধিকারকে সম্মান দেবে ও রক্ষা করবে এবং একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানবাধিকারের ভিত্তিমূলে তিনটি মৌলিক অধিকার রয়েছে — জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার।

প্রামাণিক দলিলের ভিত্তিতে চীনের সংবিধানের এই চূড়ান্ত পরিবর্তনগুলি যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পর সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া'র কেন্দ্রীয় কমিটির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ আকস্মিকভাবে নেওয়া হয়নি। কমরেড মাও সে-তুঙের শিক্ষাগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সঠিক মার্কসবাদী নীতিগুলি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এযাবৎকাল কার্যক্ষেত্রে চর্চা করে আসছিল, একটির পর একটি সেগুলি পরিত্যাগ করার অনিবার্য পরিণাম হিসাবেই এই পদক্ষেপগুলি এসেছে। আজকের অধঃপতন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারা থেকে এবং একইসঙ্গে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুতির পরিণাম। এই বিচ্যুতি শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্লেনারি অধিবেশনের অব্যবহিত পর থেকেই। লিউ শাও চি, দেং শিয়াও পিং এবং তাদের অনুগামীদের হাত ধরে আধুনিক সংশোধনবাদ যখন চীনের মাটিতে তার কুৎসিত মাথা তুলছিল, সেই আসন্ন বিপদকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় যে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ঐ অধিবেশনেই সেই মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধতা ও নিন্দা করা হয়েছিল। তখন থেকেই সমাজতন্ত্রের সমগ্র পর্যায়ব্যাপী যে শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর এবং উন্নত থেকে উন্নততর রূপে পরিচালিত হওয়ার কথা, সেই শ্রেণীসংগ্রামকে এককথায় বিদায় দেওয়া হল। এ জিনিস বুর্জোয়াদের কাছে তাদের নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার এবং নিজেদের আরও শক্তিশালী রূপে সংহত করার যথেষ্ট সুযোগ এনে দেয়। বিশ্বের জনগণ এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, মাও সে-তুঙের জীবদ্দশাতেই যে দেং শিয়াও পিংকে তাঁর পুঁজিবাদী ঝোঁক ও প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য দু'বার পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, সেই পুঁজিবাদী পথের অনুসারী রেনিগেড দেং শিয়াও পিং কীভাবে মাওয়ের জীবনাবসানের সুযোগ নিয়ে ও তথাকথিত 'গ্যাঙ অফ ফোর'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে পার্টি থেকে হাজার হাজার সত্যিকারের কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করতে শুরু করেছিল, কীভাবে পার্টি, সরকার ও পিপলস্ লিবারেশন আর্মির নেতৃত্ব থেকে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারার প্রকৃত অনুগামীদের — যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পোড়খাওয়া প্রবীণ বিপ্লবী — চোরাগোপ্তাভাবে উচ্ছেদ করেছিল। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে যে সমস্ত বিপ্লবী কমিটি এবং জনগণের সামরিক বাহিনী (people's militia) গড়ে উঠেছিল সেগুলিকেও তারা ভেঙে দিতে শুরু করেছিল এবং এইভাবে পার্টি, রাষ্ট্র এবং পিপলস্ লিবারেশন আর্মির ওপর নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

চীনের শাসকদের বিবৃতি থেকেই জানা যায় যে, সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধনের বহুপূর্বেই পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রের পরিধি হ্রাস পাচ্ছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা যত কম সংখ্যায় সম্ভব খোলার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বের (শেয়ার) আধিপত্য কমাবার জন্য অ-রাষ্ট্রীয় পুঁজির প্রবেশ ঘটানো হচ্ছিল এবং চীনের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের অর্ধেকটাই ঘটছিল অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উৎপাদনের দ্বারা। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে, এই বাস্তব পরিস্থিতিই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, বেসরকারি ক্ষেত্র ও ব্যক্তিসম্পত্তির অস্তিত্বকে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা বিধিসম্মত স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পুঁজিবাদী উৎপাদন লক্ষ্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অনুপ্রবেশ চীনের অর্থনীতির গভীরে বহুদূর পর্যন্ত ঘটে গিয়ে বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছিল। এবং এর সবটাই ঘটেছে পার্টির ও রাষ্ট্রের পূর্ণ সম্মতি ও উৎসাহদানের ভিত্তিতেই।

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি আরও লক্ষ্য করছে যে, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রগুলিতে পরীক্ষিত, স্বীকৃত ও সঠিক মার্কসীয় মৌলিক শর্তগুলির বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং এই শর্তগুলি থেকে উদ্ভূত মূল নীতিগুলির বৈপ্লবিক প্রাণসত্তাকে মেরে দিয়েই চীনের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। প্রতিবিপ্লবের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মরিয়া চেষ্টায় তারা সর্বহারা সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য যা যা দরকার তাই করেছে এবং অবক্ষয়ী, পচাগলা পশ্চিমী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকাশে অত্যন্ত চুপিসারে মদত দিতে শুরু করেছে। প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, এর পরিণামে ইতিমধ্যেই এই অবক্ষয়িত সংস্কৃতি চীনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলির গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি আরও লক্ষ্য করছে যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতিত নেতৃত্ব দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে নীতিসমূহ অনুসরণ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রশ্নেও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকাল আগেই পরিত্যাগ করেছে। বিশ্বের নানা অংশে যেসব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, নয়া উপনিবেশবাদবিরোধী ও জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন চলছে, তার প্রতি সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেছে, এবং এও দেখা গিয়েছে যে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের ভালমন্দের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চীনের নেতৃত্ব প্রকাশ্য ও গোপন সমঝোতা করছে এবং তা এতটাই গভীর যে, এখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের যোগসাজস উত্তরোত্তর প্রকাশ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে।

চীনের বিদ্যমান পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনা করার পর এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সুদৃঢ় অভিমত হচ্ছে, চীনের সংবিধানে এইসব গুরুতর সংশোধনীগুলি গৃহীত হওয়ার ফলে চীনের প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম একটি 'নোডাল পয়েন্টে' পৌঁছেছে এবং চীনে যদিও এখনও কমিউনিস্ট নামের একটি পার্টি অবস্থান করছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই বুর্জোয়াশ্রেণী তার দখল নিয়ে তাকে একটি পুরোপুরি বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত করেছে এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রও একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে ও এই বুর্জোয়া পার্টিটির একচেটিয়া শাসন, সর্বহারা একনায়কত্বের অবশিষ্টাংশকেও ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়েছে বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের। এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব এখন চীনের অর্থনীতির বাকি অংশগুলিতে অতি দ্রুত পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করার কাজেই লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং আজ আর এই সিদ্ধান্ত ও বাস্তবকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই যে, চীনের মাটিতে প্রতিবিপ্লব আপাত নীরবতার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে এবং চীনের অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবেই পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন যে, এই বেদনাদায়ক ঘটনা শুধু চীনের জনগণের কাছেই নয়, সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কাছেই এক নিদারুণ আঘাত। তাদের দুঃখ-ব্যথার সাথে পুরোপুরি একাত্ম হয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের শিক্ষাগুলিই বলে দেয় যে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অভিযানে প্রতিবিপ্লব কখনই শেষ কথা নয়। সেজন্যই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত সকল মহান মার্কসবাদী অথরিটিই বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের অন্তর্বর্তী পর্যায় মাত্র এবং অন্য সকল যুদ্ধের মতই এই শেষ শ্রেণীযুদ্ধেও বিপ্লবী শক্তির সাময়িক পরাজয় অবশ্যই ঘটতে পারে। কিন্তু সমাজবিকাশের নিয়ম একথা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, শেষপর্যন্ত বিকাশমান বিপ্লবী শক্তি, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর বিজয় এবং মুমূর্ষু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন — এই দু'টি ঘটনাই ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। সুতরাং আজ যে ঘটনাবলী দেখা যাচ্ছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

চীনের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও মহান মাও সে-তুঙের যথার্থ অনুগামীদের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি সুদৃঢ়ভাবে আশা করে যে, মহান মাও সে-তুঙের বৈপ্লবিক শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা অনতিবিলম্বে আবার সংঘবদ্ধ হবেন এবং প্রতিবিপ্লবীদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে সমাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

ছুটিতে আসা মার্কিন সেনা ইরাকে ফিরতে অস্বীকার করছে

২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাক অভিযানে যেসব মার্কিন সেনা অংশ নিয়েছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে ফ্লোরিডার ন্যাশনাল গার্ড-এর স্টাফ সার্জেন্ট ক্যামিলো মেঝিয়া। সম্প্রতি তিনি ছুটি কাটাতে ইরাক থেকে দেশে এসেছিলেন এবং ছুটি ফুরোলে যথারীতি তার ইরাক ফিরে যাবার কথা, কিন্তু তিনি ইরাকে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফ কথা, এই যুদ্ধ তেলের জন্য, তাঁর পক্ষে এই অনৈতিক যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। ইরাকে ফিরে যেতে স্টাফ সার্জেন্ট ক্যামিলো মেঝিয়ার এই অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ হয়তো তাকে 'দলছুট' ঘোষণা করতে পারে, যার অবধারিত শাস্তি হচ্ছে কোর্ট মার্শাল। এ শাস্তির কথা মাথায় রেখেও ক্যামিলো ইরাকে ফিরে যেতে চান না। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে তাঁকে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। (রয়টার্স, ডি পি এ, হিন্দুস্থান টাইমস ১৮-৩-০৪)

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

তিনের পাতার পর

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সাথে সাথে সাংবিধানিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ধাঁচা বাহ্যত বজায় রেখে, প্রযুক্তিবিজ্ঞান এবং ধর্মের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, হিন্দুত্বের নামে তীব্র জাতি-বিদ্বেষ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ চর্চা করে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক পরিত্যক্ত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করে, চিন্তার যন্ত্রীকরণ ঘটিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে উদ্যত হয়েছে।

নির্বিচারে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ফ্যাসিবাদী কায়দায় গণআন্দোলন দমন করার সাথে সাথে সঙ্কীর্ণতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ, পৃথকতাবাদ এবং জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি ছড়িয়ে জনগণকে জনগণের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বিতীয় মারাত্মক উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে, একদিকে পুঁজিবাদের নির্মম শোষণে পিষ্ট সাধারণ মানুষ শোষণের জ্বালা সইতে না পেরে দেশের সর্বত্র প্রতিনিয়ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, মালিকশ্রেণী-পুঁজিপতিশ্রেণীর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে প্রতিকার চাইছেন। কিন্তু, কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকারগুলি, জনগণের অতীব ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নেওয়া দূরে থাক, লাঠি ও গুলির সাহায্যে সেগুলি নির্মমভাবে দমন করছে। এমনকী এ কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করতেও দ্বিধা করছে না। পোটা (POTA) জাতীয় মারাত্মক ধরনের গণতন্ত্র হত্যাকারী নানা ফ্যাসিবাদী আইন প্রণয়ন করছে। নানা অজুহাত খাড়া করে দেশের বিভিন্ন অংশে শিখণ্ডি সরকার খাড়া করে কার্যত সামরিক শাসন কায়েম করেছে। এইভাবে জনসাধারণের শেষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ মৌল অধিকার 'বাঁচার অধিকার'কেও (right to life) বিপদাপন্ন করে তুলছে। এইসব বিক্ষোভ আন্দোলনগুলি যাতে একটি সুসংহত, সুসংগঠিত সর্বভারতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত না হয়, যাতে এগুলির উপরে দেশের বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী এবং পুঁজিপতি শাসকরা কোন চেষ্টারই অবধি রাখছে না। প্রতিদিনই নানা দিকে নানা ছক তারা কষছে। এই উদ্দেশ্যেই তারা শুধু হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নয়, ভাষা-সংস্কৃতি-আঞ্চলিক পার্থক্য-জাতপাত-গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রশ্নের অবতারণা করে বিভেদমূলক সঙ্কীর্ণতাবাদী সাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে। জনগণকে জনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, প্ররোচিত করে ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত সংঘর্ষের জন্ম দিচ্ছে। ভারতবর্ষের এক অংশের জনগণ অন্য অংশের জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন। এইভাবে দেশের নানা অঞ্চলে, একই ধরনের পুঁজিবাদী শোষণ এবং শাসনে পিষ্ট ক্লিষ্ট জনগণ, জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে পুঁজিবাদী নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথ পরিহার করে জাতপাত-ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণ ইত্যাদির নামে মারাত্মক ধরনের সঙ্কীর্ণতাবাদী, পৃথকতাবাদী খণ্ড চিন্তার বাহক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই এইসব আন্দোলনগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। এইভাবেই লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের আত্মদান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে উঠেছিল তার সংহতি এবং মহান ভারতীয় জনগণের ঐক্য চুরমার হয়ে যাচ্ছে। শাসক-শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে অনুসৃত রাজনীতি দেশের জনগণকে কেবল নিষ্ঠুর এবং নির্মমভাবেই শুষে মারছে শুধু নয়, গোটা দেশের অস্তিত্বকেই বিপদাপন্ন করে তুলছে।

অনৈতিক জীবনধারার দ্রুত বিস্তার, নারী নির্যাতনের তীব্রতা বৃদ্ধি, মনুষ্যত্ববোধের দ্রুত অবক্ষয় — এগুলির মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদের চূড়ান্ত সামাজিক সঙ্কটই ফুটে উঠেছে

এই দুঃসহ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেশের জনসাধারণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। গোটা সমাজকাঠামো, সমাজের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এর দ্বারা আজ আক্রান্ত। সামাজিক ও মানবিক সমস্ত মূল্যবোধ সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এর প্রথম বলি মানুষের পারিবারিক জীবন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার শেষটুকু হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে একান্নবর্তী পরিবার বিলুপ্ত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমন্বয়ে যে নতুন পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও অস্তিত্ব আজ বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে মানবিক সম্পর্কের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, অভাব-দারিদ্র্য-নিরাপত্তাহীনতা এবং মূল্যবোধের ক্রমঅবক্ষয়ের ফলে তার শেষটুকুও আজ প্রায় অন্তর্হিত। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, কেউই আজ আর নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে চিনতে বুঝতে রাজি নন। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র মানসিকতা এবং এর থেকে উদ্ভূত বিষবাষ্প সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীন এই পরিবেশে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে উৎকট মানসিক রোগও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্কটের অপর দিক হচ্ছে — সামাজিক ক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জোর করে অর্থসংগ্রহ, অপহরণ, হত্যা, নারীপাচার, ইত্যাদি, অ-নৈতিক জীবনধারা অভাবগ্রস্ত বেকার ছাত্রযুবদের দ্রুত গ্রাস করছে। মদ, ড্রাগসের প্রকোপ তাদের যৌবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। নারী জাতি, মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে এবং নারী নির্যাতন জঘন্য থেকে জঘন্যতর রূপ পরিগ্রহ করছে। এককথায় সমগ্র সমাজজীবন থেকে মনুষ্যত্ববোধই দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র প্রভৃতি সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে অশ্লীলতা এবং কুৎসিত যৌনতার প্রাদুর্ভাব দ্রুতগতিতে বাড়ছে শুধু নয়, মানুষের এই মনুষ্যত্বহীনতার মারাত্মক প্রভাবে এগুলির সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি একটি গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কটও সমগ্র দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

এইভাবেই গোটা দেশ আজ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক — সবদিক থেকেই এক সর্বগ্রাসী সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।

পুঁজিবাদী শোষণের আসন্ন সর্বনাশা বিপদ সম্পর্কে ১৯৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের হুঁশিয়ারি এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশ সর্বাংশে সত্য বলে প্রমাণিত

স্বাধীনতার পর বিগত ৫৭ বছরে নির্বাচন বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধানসভা-লোকসভার সদস্যদেরও পরিবর্তন হয়েছে। নির্বাচনে হার-জিতের মধ্য দিয়ে একাধিক দল ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং ক্ষমতায় বসেছে। কিন্তু উপরোক্ত শ্বাসরোধকারী অবস্থার বিন্দুমাত্র উপশম ঘটেনি, বরঞ্চ সমস্ত প্রকার সমস্যা তীব্র থেকে আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিল্পজাত ও কৃষিজাত উৎপাদন দেশে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের কেন এই হৃদয়বিদারক অবস্থা? দেশের আপামর জনসাধারণ — খেটে খাওয়া মানুষ থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তি — সকলের কাছেই এই প্রশ্ন গমকে গমকে আসছে। মানুষের মনে এই প্রশ্ন এইভাবেই আসবে — এটা সম্যক উপলব্ধি করেই এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, মহান কমিউনিস্ট শিক্ষক, আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, কমরেড শিবদাস ঘোষ দল প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন — ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত ত্যাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করে ভারতবর্ষের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে এবং এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্য — কেবল সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসান নয়, সমস্ত রকম শোষণের অবসান ঘটবে, মুষ্টিমেয় ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ভারতের কোটি কোটি মানুষের শোষণ ও শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হবে এবং শোষণহীন সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে — জনসাধারণের এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা অপূরিত থেকে গেছে। তিনি বলেছিলেন, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী এইভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে তারই অমোঘ নিয়মে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা আরও ধনী হবে, তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তির পরিমাণ দিনের পর দিন পাহাড় প্রমাণ হবে এবং এরই চাপে সাধারণ মানুষের জীবন বিধ্বস্ত হবে। বলেছিলেন, সরকার ও রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। সরকার পাল্টালেই রাষ্ট্র পাল্টায় না। ইলেকশন মারফৎ সরকার পাল্টানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্র একই থাকে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রযন্ত্র অনেকটা মেশিনের মত। সরকারের কাজ তাকে দেখভাল করা। তাই এই রাষ্ট্রকে অপসারণ করতে হলে বিপ্লবের আঘাতেই তা করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় আসমুদ্র হিমাচল গণজাগরণ এবং গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে, রুশ বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের অনুসরণে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে লাগাতার শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলে, বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য দাবিগুলি আন্দোলনের চাপে আদায় করতে হবে। লোকসভা হোক-বিধানসভা হোক, যে কোন স্তরের নির্বাচনকেই এই গণআন্দোলনগুলির স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। এই অতীব জরুরি গণআন্দোলনের আওয়াজ যথাযথভাবে লোকসভা-বিধানসভার ভেতরে উত্থাপন করতে সক্ষম, গণআন্দোলনে পরীক্ষিত এমন ব্যক্তিদেরই যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব লোকসভা-বিধানসভার ভেতরে পাঠাতে হবে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের কোন মোহ, কোন প্রলোভনে না পড়ে বিধানসভা-লোকসভার ভেতরে এবং বাইরে নিঃস্বার্থ এবং নিরলসভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারায় কাজ করে যেতে হবে। দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, রাজনীতিতে অনেক পক্ষ দেখা গেলেও এবং কাগজগুলো অনেক পক্ষ দাঁড় করালেও, ভুললে চলবে না যে, জনগণের সর্বপ্রকার শোষণমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে পক্ষ হচ্ছে মাত্র দুটো — একটা বিপ্লব, আর একটা বিপ্লববিরোধিতা — তা সে যে নামেই হোক। বলাবাহুল্য তাঁরই এই পথনির্দেশ অনুসরণ করে গড়ে ওঠার পর থেকেই এস ইউ সি আই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংসদীয় এবং সংসদ বহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রেই জীবনজীবিকা সংক্রান্ত দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

এই মূল রাজনৈতিক লাইন এবং তা অনুসরণে এস ইউ সি আই গড়ে ওঠার পর সুদীর্ঘ ৫৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রতি বছর প্রতি দিন সামাজিক সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে, কমরেড শিবদাস ঘোষ উদ্ভাবিত পার্টির এই মূল রাজনৈতিক লাইনের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে। অপরদিকে দেশের সর্বত্র শ্রমজীবী জনসাধারণ থেকে শুরু করে সৎ, চিন্তাশীল মানুষ এস ইউ সি আই-এর প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরই সমর্থনে দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। একইসঙ্গে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন এবং শোষণের চিত্রটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদ দিনের পর দিন আরও সংহত হচ্ছে। জনসাধারণের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং শোষণ অসহনীয় রূপ নিচ্ছে।

বিজেপি ও কংগ্রেস — দুই দলই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার বিশ্বস্ত হাতিয়ার

এই পরিস্থিতিতেই চতুর্দশ লোকসভা এবং একইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা এবং সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক হিসাবে দু'টি জোটকেই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে, একদিকে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ জোট, অপরদিকে কংগ্রেস পরিচালিত দ্বিতীয় জোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করেও বিজেপি বিগত পাঁচ বছর বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি অনুগত দলগুলিকে নিয়ে নিরুপদ্রবে পাঁচটা বছর শাসন চালিয়েছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করে আরও বেশি করে তাদের আস্থাভাজন হয়েছে। কংগ্রেসও এককভাবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা না দেখে জাতপাতভিত্তিক, এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি'র লাইনেই জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। বলাবাহুল্য এই দুই বুর্জোয়া শিবিরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

পাঁচের পাতার পর

জোটবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শ-কর্মসূচির কোন বালাই থাকছে না। যারা জোটবদ্ধ হচ্ছে তাদের একটাই চিন্তা — কাকে সঙ্গে নিলে, কিংবা কোন জোটে গেলে আসন সংখ্যা বাড়বে। এটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হিসাবে কাজ করছে। এমনকি এই দুই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির বিশিষ্ট ও নামকরা ব্যক্তিরা পর্যন্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে নিঃসঙ্কোচে দলবদল পর্যন্ত করে চলেছে। জনসাধারণ এই জোটবদ্ধ হওয়ার বা দলবদলের প্রক্রিয়ায় ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক সুবিধাবাদ লক্ষ্য করছেন এবং ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিউরে উঠছেন।

নির্বাচকমন্ডলীকে তাই দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা, বিজেপি-কংগ্রেস সহ প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের বাস্তব অবস্থানকে গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। দেশের নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে — সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর থেকেই, কংগ্রেসের শাসনকালে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনভাবেই সংঘাতে না যাওয়ার নীতির অনুসরণ শুরু হলেও, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল সেই নীতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ ইরাক আক্রমণের প্রশ্নে বিজেপি সরকারের আমেরিকাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট না করার মনোভাব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। আর কেবল ইরাক প্রশ্নেই নয় — সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতায় পরিপুষ্ট আপামর জনসাধারণ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছেন যে, দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যকে ধূলায় লুটিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আজ প্রকাশ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করছে। আর শুধু পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেই নয়, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রশ্রয় পেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলাবার চেষ্টা করছে। যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি এবং কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ স্থায়ী, ন্যায়সংগত এবং কাশ্মীর সহ উভয় দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান খুঁজে বের করা — এই দু'টি কাজই খুবই জরুরি হলেও, এই প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ দেশের জনগণের কাছে চিন্তারও অতীত। অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিজেপি সরকারের আস্কারায় এবং কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে সেই সর্বনাশই ঘটতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে, মুখে উন্নয়ন, আর তলে তলে হিন্দুত্বের নামে গোটা সংঘ পরিবারের মুসলিম বিরোধী প্রচারের ন্যক্কারজনক রণকৌশলের ভিত্তিতেই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় — এই তিনটি রাজ্যে সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এবং ক্ষমতায় বসেই নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটকে সামনে রেখে হিন্দুত্বের নামে একের পর এক মুসলিম বিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই একই ন্যক্কারজনক রণনীতি নিয়েই সংঘ পরিবার লোকসভা নির্বাচনেও নামছে। রেডিও-টেলিভিশন-পত্রপত্রিকার সহায়তায় উন্নয়নের ধূম্রজাল, আর তারই আড়ালে আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপির পক্ষে, তীব্র মুসলিম বিরোধী প্রচার অবিরাম চলছে। লক্ষ করা যাচ্ছে, পুরাতন কংগ্রেসী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদেরও এই দুষ্কার্য আড়াল করার কাজে লাগানো হচ্ছে। এইভাবেই গুজরাটের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অপরদিকে কংগ্রেস সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে ধর্ম নিরপেক্ষতার পতাকা উড়িয়ে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভোটদাতাদের মন জয় করার চেষ্টা করছে, আবার হিন্দুধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিজেপি'র হিন্দুত্বের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে 'নরম হিন্দুত্বের' নামে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চা করছে।

আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের নামে যে সর্বনাশা অর্থনৈতিক নীতি নরসিমা রাও-মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ১৯৯১ সনে প্রবর্তন করেছিল, যা বিজেপি ক্ষমতায় এসে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করছে, দেখা যাচ্ছে, খুব স্বাভাবিক কারণেই এই দুই জোটের 'মহারণে' এটি কোন ইস্যু হিসাবেই আসছে না। অর্থ খুবই পরিষ্কার। যারাই ক্ষমতায় আসুক, এই নীতির কোন হেরফের হবেনা। এই তথাকথিত বিশ্বায়নের নীতি আরও তীব্রতার সঙ্গে অনুসৃত হবে।

বিজেপিকে রোখার নামে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে সি পি এম-সি পি আই আসলে ভোটের লড়াইয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে

এই পরিস্থিতিতে জনজীবনকে পুঁজিপতিশ্রেণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আধার হিসাবে প্রকৃত বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলা এবং সংসদ ও বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে একই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ালেও, লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর কল্যাণে ও তাদের প্রচারে বলীয়ান হয়ে সি পি আই (এম), সি পি আই এবং তাদের সহযোগীরা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের মঞ্চ আলোকিত করে বসে আছে। এদের পুঁজিবাদ ঘেঁষা, সংস্কারবাদী রাজনীতি এবং গণআন্দোলন সম্পূর্ণ বর্জন করে সংসদীয় রাজনীতির বৃত্তের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখার সুনিপুণ প্রয়াসের ফলে, প্রকৃত বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোন ক্ষেত্রই প্রশস্ত হচ্ছে না। পুঁজিপতিশ্রেণীর সন্তুষ্টি বিধানে ব্যগ্র, কোনভাবেই তাদের অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে ওঠা এবং তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে পরিষদীয় রাজনীতির চর্চা করে ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা — এটাই এই সমস্ত তথাকথিত বামপন্থী দলের রাজনীতির বুনিয়াদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলেই যতদিন যাচ্ছে দেশে বামপন্থী আন্দোলন দ্রুত দুর্বল হচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, এদের মুখে বামপন্থী রাজনীতির বুলির উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এই আদর্শবর্জিত দ্বিচারিতাকে আড়াল করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকেই রক্ষা করা। তাই দেখা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্লোগান তুলে যে কংগ্রেস নরম হিন্দুত্বের নামে একই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করছে তার সাথে এরা নির্দ্বিধায় সুবিদাবাদী জোট গড়ে তুলছে।

এহেন পরিস্থিতিতে বিজেপি, আর এস এস-এর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করার চিন্তাই সমস্ত সৎ, চিন্তাশীল মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। চিন্তাশীল মানুষের কাছে এটা আজ অজানা নয় যে, সংঘপরিবার এবং বিজেপি'র এই বিপজ্জনক উত্থানের পেছনে পুঁজিপতিশ্রেণীর মদত সহ অন্যান্য কিছু কারণ কাজ করলেও দেশে প্রকৃত বামপন্থী আদর্শের ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউয়ের অনুপস্থিতিই মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তাই নিছক ভোটের মাধ্যমে সংঘ পরিবার এবং বিজেপি'র আদর্শগত এবং সাংগঠনিক প্রভাব রোধ করার চিন্তা কল্পনাবিলাস কিংবা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। পুনরুজ্জীবিত ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই হচ্ছে এই বিপজ্জনক রাজনীতিকে পরাস্ত করার একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষেধক। কিন্তু সি পি আই (এম), সি পি আই নেতৃত্ব সেই পথেই হাঁটছেন না। অতীতেও তাঁরা পুঁজিপতিশ্রেণীর অতীব আস্থাভাজন কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রগতিশীল দিক খুঁজে পেয়েছেন, আজও কংগ্রেসের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতা পরাস্ত করার উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন।

বিজেপি'র এই উত্থানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উল্লেখনীয় দিক হচ্ছে, মুখে হিন্দুত্ব, আর আসলে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষ এই নিয়ে স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর আগে আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা গড়ে উঠলেও শক্তিশালী স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতাবরণে তারা সেদিন বেড়ে উঠতে পারছিল না। স্বাধীনতার পর জনসংঘ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করলেও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ততটা বাড়েনি। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরিণামে কংগ্রেস জনসমর্থন হারিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছায়, যখন পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে শত চেষ্টা করেও তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হচ্ছিল না। তখনই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী, বিজেপিকে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী বিকল্প দল হিসাবে মদত দিতে শুরু করে। তাই বিজেপিকে সামনে রেখে আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের শাসন ক্ষমতায় বসার পেছনে এটিও একটি মুখ্য কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিজেপি'র এই অভ্যুত্থানের পিছনে সিপিআই(এম)-সিপিআই-এর মার্কসবাদ এবং বামপন্থা বর্জিত রাজনীতির ভূমিকাও কম নয়। অতীতে সিপিআই (যার মধ্যে সিপিআই(এম)-ও ছিল) যেমন সেক্যুলারইজমের ভিত্তিতে কোন আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেনি, উপরন্তু ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্ব খাড়া করে দেশভাগ সমর্থন করেছিল, তেমনি আজও সি পি এম সেক্যুলারইজমের শ্লোগান তুললেও পরোক্ষভাবে হলেও ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক শক্তির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে যাচ্ছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, '৭৩-'৭৪ সালে হিন্দি বলয়ে ইন্দিরা সরকারবিরোধী ব্যাপক ছাত্র-যুব আন্দোলনকে ব্যবহার করেই বিজেপি বর্তমান শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু তৎকালীন জনসংঘ (বর্তমানে বিজেপি) ও সংঘ পরিবার এই সুযোগ পেত না যদি এই আন্দোলনে সিপিআই(এম) এবং সিপিআই থাকত ও বামপন্থী ধারায় সেদিন সেই আন্দোলন পরিচালনা করত। কিন্তু তখন সিপিআই-এর সাথে প্রকাশ্যে ও সিপিআই(এম) -এর সাথে গোপনে ইন্দিরা কংগ্রেসের বোঝাপড়া থাকায় তারা এই আন্দোলনে থাকলো না এবং জনসংঘ খোলা ময়দান পেয়ে আন্দোলনকেও ডোবাল এবং শক্তিও বাড়াল। আবার এই সিপিআই(এম) যখন '৭৭ সালে দেখল যে, জনসংঘ-মোরারজি কংগ্রেস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত জনতা পার্টির পক্ষে ভোটে প্রবল হাওয়া বইছে, তখন রাতারাতি ভোল পাল্টে কংগ্রেসের 'স্বৈরাচার বিরোধিতা'র আওয়াজ তুলে এই জনতা পার্টির সাথেই মৈত্রী গড়লো। এভাবে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের মর্যাদা ও শক্তিবৃদ্ধিতে আরেকভাবে সাহায্য করল। এখানেই শেষ নয়। '৮৯ সালে বিজেপি ও সিপিআই(এম) হাত ধরাধরি করে ভি পি সিং-কে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাল। সেদিন কলকাতার শহীদ মিনারে বাজপেয়ী ও জ্যোতি বসু শুধু এক মঞ্চে মিটিংই করেন নি, বিজেপি'র সমর্থনে সিপিআই(এম) কলকাতা করপোরেশনের গদী দখল করেছিল, এমনকি আদবানির রথকে পুরুলিয়ায় ঢুকতে দিয়েছিল, যার ফলে সেখানেও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়েছিল।

বলাবাহুল্য এদের এই সুবিধাবাদী রাজনীতির ফলে উন্নত নীতি, নৈতিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে এবং এই পরিবেশেই আরএসএস-বিজেপি'র দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে।

বিজেপি'র বিপজ্জনক এই শক্তিবৃদ্ধি প্রতিহত করার প্রশ্নে দ্বিতীয় যে বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা উচিত, তা হচ্ছে, আজকের দিনে শোষিত জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্যবোধে ভীত শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনীতি বিভাজনবাদী না হয়ে পারে কি? জাতপাত-গোষ্ঠী-বর্ণ-ধর্ম এগুলোর নামে বিভাজনবাদ চর্চা না করে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে কি? আমাদের দেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ, এমনকি ইউরোপ আমেরিকার অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর অবস্থা কী দেখাচ্ছে? পুঁজিপতিশ্রেণীর অতীব বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের একটানা ৪৫ বছরের শাসনে আর এস এস এবং জনসংঘের, এবং পরবর্তীকালে বিজেপি'র উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা কংগ্রেসের আদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে কোন একজায়গাতেও সংঘাতের সম্মুখীন না হয়ে দ্রুত ছড়ালো কি করে? কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও দেশের প্রতিটি রাজ্যে সারা বছর কোন না কোন জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণ ঘটল কীভাবে? সচেতন রাজনৈতিক মহলে আজ আর এটা অজানা নয় যে, একদিকে, আর এস এস এবং জনসংঘের সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ কঠোর হাতে দমন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সেগুলোকে নিরুপদ্রবে ঘটতে দেওয়া, আর অপরদিকে সংখ্যালঘু মুসলিম জনসাধারণের কাছে গিয়ে আর এস এস-জনসংঘ-বিজেপি'র হাত থেকে বাঁচতে হলে 'আমাদের ভোট দাও', 'আমাদের সঙ্গে থাকো' — শাসনক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস প্রকাশ্যেই এই রাজনীতিরই চর্চা করেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি

সাতের পাতায় দেখুন

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

ছয়ের পাতার পর

আওড়ালেও কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের দিন থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ধর্মনিরপেক্ষ বা 'সেক্যুলার' রাষ্ট্র গঠনের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্র, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমস্ত কিছুকে চার্চের প্রভাব বা ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য। তাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করবে এবং সমস্ত রকম ধর্ম, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রচার থেকে বিরত থাকবে এবং এই উদ্দেশ্যেই সমস্ত ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বলাবাহুল্য কংগ্রেস তার জন্মের পর থেকে কোনদিনই ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিজ্ঞান এবং ইতিহাসসম্মত ধারণার ধারকাছ দিয়েও যায়নি। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে ক্ষমতায় বসে ধর্মকে উৎসাহিত করার অগণতান্ত্রিক রাজনীতিই চর্চা করেছে এবং এইভাবে আর এস এস-বিজেপি'র অভ্যুত্থানের জমি তৈরি হয়েছে। আর শুধু তাই নয় — শেষের দিকে ভোটের দৌড়ে বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য নগ্নভাবে আর এস এস-বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক লাইনই কার্যত কংগ্রেস অনুসরণ করেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ক্ষমতায় যদি সে আবার আসেও, তাহলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ালেও কোনভাবেই আর এস এস-বিজেপি'র সঙ্গে এই প্রশ্নে সংঘাতে না যাওয়ার একই রাজনীতির চর্চা করবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এই সমস্ত দিক উপেক্ষা করে সি পি আই(এম), সি পি আই তাদের বিজেপিকে রোখার 'পবিত্র সংগ্রামে' এই কংগ্রেসকেই সারথি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সমগ্র দেশে প্রকৃত বামপন্থী ভাবাদর্শে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষকে বেঁচে থাকার আন্দোলনে একত্রিত করে সেই পথে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে বিজেপিকে প্রতিহত করার পথে না গিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর আর এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরিণাম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। বলাবাহুল্য কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নির্বাচন লড়ার এই নীতির মধ্য দিয়ে সি পি আই(এম), সি পি আই'র যেকোন ভাবেই হোক নিজেদের আসন সংখ্যা বাড়াবার সুবিধাবাদী ঝোঁকই প্রকট হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নির্বাচন লড়ে, ধর্মীয় উন্মাদনাকে ব্যবহার করে আধা ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে উদ্যত আর এস এস-বিজেপিকে রোখার যে তত্ত্ব সি পি আই (এম)-সি পি আই আওড়াচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে তাদের আর এস এস-বিজেপিকে রোখার কথাটাও কতটা আন্তরিকতাহীন তাও ফুটে উঠেছে। তাই এই কথাটাও আজ আর গোপন থাকছে না যে, বিজেপিকে রোখার কথা বলে জনমতকে বিভ্রান্ত করে চূড়ান্ত জনবিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে পরিষদীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান গুছিয়ে নেওয়াই এই রাজনৈতিক লাইনের মূল কথা। এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা এ কথাটা বলতে চাই, প্রধানত হিন্দুধর্মাবলম্বী জনসাধারণ অধ্যুষিত এই দেশে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-মহল্লায় আদর্শগত প্রচারের মাধ্যমে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে না পারলে নির্বাচনেও বিজেপিকে হারানো সহজ হবে না। আর যদি কোনভাবে হারানোও যায়, শুধুমাত্র তার দ্বারা আর এস এস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নির্মূল করা যাবে না। আর তা করতে না পারলে সংখ্যালঘু নির্যাতনও বন্ধ হবে না, বিজেপি'র পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার পথও বন্ধ হবে না। ইতিমধ্যে জনসাধারণ দেখেছেন, যে সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, কিভাবে সেইসব রাজ্যে একই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চা করে সে আবার অতি সহজেই ক্ষমতায় ফিরে আসছে অথবা ফিরে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

এই প্রশ্নে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদকামী রাজনীতির চর্চা করার দিকটি ছাড়াও পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দল হিসাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস যেভাবে জনমানসে জনগণের চরম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই প্রেক্ষাপটে তাকে সাথে নিয়ে আর এস এস-বিজেপির বিরুদ্ধে এই আদর্শগত অভিযান গড়ে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ সি পি আই (এম) এবং সি পি আই এবং তাদের সহযোগীরা ভোট বৈতরণী পার হওয়ার তাগিদে সেই 'তত্ত্বই' হাজির করছেন। দেশের বামপন্থী আন্দোলনের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ট্র্যাজিক দিক।

নির্বাচনকে বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করুন

স্পষ্টতই এর ফলে বিজেপি এবং কংগ্রেস — পুঁজিপতিশ্রেণীর আজ্ঞাবহ জনগণের এই দুই শত্রুকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা প্রকৃত বামপন্থী গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মঞ্চ গড়ে তোলার এবং তার মধ্য দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারত, সি পি আই (এম)-সি পি আই'র কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নির্বাচন লড়ার এই নীতির ফলে সেই সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে মার খেল। সি পি আই(এম)-সি পি আই-এর এই অদূরদর্শী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে কংগ্রেস এবং বিজেপি'র মধ্যেই দেশের ভোটদাতা জনসাধারণের ভোটদানকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণীর যে প্রয়াস সেটাই পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

একই সাথে এটাও বোঝা যাচ্ছে, দেশের এই পথহারা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন সমস্যা মোকাবিলার সঠিক পথ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে না, তখন আসন্ন নির্বাচনের প্রহসনকে কাজে লাগিয়ে এই দুই প্রতিপক্ষের এক পক্ষ ক্ষমতাসীন হবে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জনজীবনের উপর একটার পর একটা আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসবে এবং জনসাধারণের জীবনকে আরও শ্বাসরোধকারী, আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। তাই ভোটদাতা জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, এই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্রতর করার সঙ্কল্পে একটি রাজনৈতিক সংগ্রামে পর্যবসিত করুন। দেশের অসহনীয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির চুলচেরা সঠিক বিচার বিশ্লেষণ এবং জনজীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের সঠিক পথ নির্ধারণই হোক এই নির্বাচনের অন্যতম লক্ষ্য। ধনী ও গরিবে বিভক্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একদিকে রয়েছে ধনীর স্বার্থরক্ষাকারী পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন দল, অন্যদিকে গরিব শোষিতের স্বার্থরক্ষাকারী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দল। ধনিকশ্রেণীর দলগুলি ধনীদের স্বার্থে এই সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, অন্যদিকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল ক্রমাগত গণআন্দোলন শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পথকেই প্রশস্ত করে। নির্বাচনও এই রাজনৈতিক মূল সংগ্রামের বাইরে নয়। তাই আমাদের সুদৃঢ় আহ্বান — বিজেপি এবং কংগ্রেস পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত এই উভয় জনশত্রুকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে, সংসদের ভেতরে এবং বাইরে গণআন্দোলন শক্তিশালী করার ঐতিহাসিক প্রয়োজন এই নির্বাচনের মূল বিচার্য বিষয় হয়ে উঠুক। দেশের সর্বত্র পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেঁচে থাকার পক্ষে জরুরি দাবিগুলি একের পর এক পূরণের জন্য সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া উন্নত নীতিনৈতিকতার আধারে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে ভারতের সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ অবহিত আছেন। বলাবাহুল্য এই প্রচেষ্টাকে দ্রুততর এবং সর্বব্যাপক করা অতি অবশ্যই একটি জরুরি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। ভোটদাতা জনসাধারণের প্রতি তাই আমাদের ঐকান্তিক আবেদন — জাতীয় রাজনীতির এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে এই সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য এবং লোকসভা এবং বিধানসভার অভ্যন্তরে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য, এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে লোকসভা এবং চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, তেভাগা আন্দোলনের নেতা কমরেড ব্যাহৃতিদেব অগস্তির জীবনাবসান

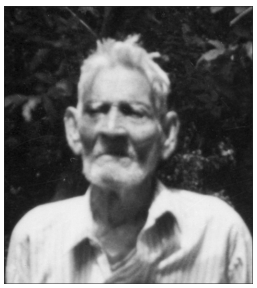

এস ইউ সি আই-এর পূর্বমেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার কর্মী কমরেড ব্যাহৃতিদেব অগস্তি ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় ৯৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সবার কাছে তিনি ভাকু অগস্তি নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৩০ সালে তিনি লবণ আইন অমান্য করে স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করেন। '৪০ এর দশকে সি পি আই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। নন্দীগ্রাম ও ভগবানপুর থানার কৃষকদের সংগঠিত করে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই সময় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ দিন জেলে কাটান। নেতৃত্বের আপসকামী নীতি, জোতদারদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া, ৭০-এর দশকে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত প্রভৃতি কারণে তিনি সি পি আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি উদ্বুদ্ধ হন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় গড়ে ওঠা এস ইউ সি আইকেই সঠিক কমিউনিস্ট দল মনে করেন এবং নন্দীগ্রামে দলের সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

কমরেড ব্যাহৃতিদেব অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনাযাপন করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন গ্রহণ করেননি। তেভাগা আন্দোলনের ৪০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সিপিআই-সিপিএম'র পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দিতে চাওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বয়সের ভারে হাঁটাচলার অক্ষমতা সত্ত্বেও স্থানীয় আন্দোলনগুলিতে তিনি অংশ নিতেন। বয়সে প্রবীণ ও বহু আন্দোলনে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নবীন কমরেডদের নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে তাঁর কখনো অসুবিধা হয়নি।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে দলমত নির্বিশেষে এলাকার বহু নারী-পুরুষ এসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ মানিক মাইতি, ভবানীপ্রসাদ দাস ও নন্দ পাত্র তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

কমরেড ব্যাহৃতিদেব অগস্তি লাল সেলাম

কোচবিহারে আন্দোলনের চাপে নারী নির্যাতনকারী গ্রেপ্তার

বিয়ের দেড়মাসের মধ্যেই খালাসিপট্টির গৃহবধূ কাজল হরিজনের জীবনদীপ নির্বাপিত হল। বিয়ের পর থেকেই মোটর সাইকেল সহ নানা যৌতুকের দাবিতে কাজলের উপর চলছিল মানসিক চাপ। শেষপর্যন্ত শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন এবং তাতেই মৃত্যু হয় কাজলের। প্রতিবাদে এগিয়ে আসে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। আন্দোলনের চাপে স্বামী, ভাসুর, শাশুড়িকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২৬ মার্চ জেলা জজ আদালতে অপরাধীদের তোলা হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জামিন নাকচ করার আবেদন জানানো হয়। বিচারক জামিন নাকচ করে দেন। ১৬ মার্চ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় খাগড়াবাড়ির গৃহবধূ মিঠু সাহার। ঘরে-বাইরে নারীর জীবন যেভাবে বিপন্ন হচ্ছে, তার প্রতিবাদে সকলকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা রীনা ঘোষ ও টাউন কমিটির সম্পাদিকা যূথিকা নাথ।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বিজেপি'র 'ভারত উদয়'
সি পি এম'র 'পশ্চিমবঙ্গ উদয়'

মজুরি বেড়েছে?

ভোটের মুখে বিজেপি ও সি পি এম উভয়েই কেন্দ্রে ও রাজ্যে সাফল্যের দাবি করে অর্ধসত্য ও মিথ্যার ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। রাজ্যের হতদরিদ্র খেতমজুরদের অবস্থার কত উন্নয়ন সি পি এম ঘটিয়েছে তার ফিরিস্তি দিয়ে গণশক্তিতে (১-৪-০৪) তারা লিখেছে — ''খেতমজুরদের দৈনিক মজুরি গত ১৯৯৭-৯৮ সালের ৪২.৫৪ টাকা থেকে বেড়ে ২০০২-০৩ সালে হয়েছে ৫৭.৯২ টাকা। মজুরিবৃদ্ধির এই হার এই সময়কালে খেতমজুরদের ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের বৃদ্ধির হারের থেকেও বেশি।'' তারা দেখাতে চেয়েছে, তাদের শাসনে খেতমজুরদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে।

কী কী বলেনি সি পি এম

* প্রথমত তারা বলেনি সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি হল ৬২.৫০ টাকা, যা ২৭ বছর বামফ্রন্ট রাজত্বের পরও এ-রাজ্যের খেতমজুররা পায় না।

* দ্বিতীয়ত বছরে ক'দিন কাজ পায় খেতমজুররা? বর্তমানে গড়ে বছরে তারা ১১৪ দিন কাজ পায়। ফলে তারা বছরে ২৫১ দিন কোন মজুরিই পায় না।

ভেবে দেখুন

সি পি এম বলেছে, ৫ বছরে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে (৫৭.৯২-৪২.৫৪) ১৫.৩৮ টাকা, অর্থাৎ বছরে ৩.০৭ শতাংশ। এটা নাকি খেতমজুরদের ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। সকলেই জানেন, গরিব মানুষের রোজগারের প্রায় সবটাই খরচ হয় শাকভাত খেতে। সি পি এমই বলছে, দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য রেশনে গম ও চালের দাম যথাক্রমে ২.৫০ এবং ৩.৫০ টাকা থেকে হয়েছে ৪.৫০ ও ৫.৯০ টাকা, অর্থাৎ গমের দাম ৫ বছরে ৮০ শতাংশ ও চালের দাম বেড়েছে ৬৮.৫ শতাংশ, অর্থাৎ বছরে চাল ও গমের দাম বেড়েছে গড়ে ১৬ শতাংশ ও প্রায় ১৪ শতাংশ হারে। কেরোসিনের দাম ২.৫৮ টাকা থেকে হয়েছে ৯ টাকা। সি পি এম নেতারা বলুন — এর পরেও খেতমজুরদের বছরে ৩.০৭ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধিতে প্রকৃত আয় কমেনি কি?

বিজেপি'র সুখের হাওয়া বইছে না গরিবের বস্তিতে

বিজেপি'র প্রচারে দেশের আর্থিক বিকাশের হার যখন ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে তখনই দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বাস করছে বস্তির ঘুপচি ঘরে। বস্তিবাসীর সংখ্যাও বাড়ছে বছরে বছরে।

বস্তিবাসীর সংখ্যা (লক্ষের হিসাবে)

	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
ভারত	২৭৯.১৪	৪৬২.৬১	৬১৮.২৬
পশ্চিমবঙ্গ	৩০.২৮	৫১.৯৫	৬৫.৭৮
কলকাতা	৩০.২৮	৩৬.২৬	৪৩.১৫

অর্থাৎ ১৯৮১ সালের পর কলকাতা ছাড়াও মফঃস্বলের গঞ্জ এলাকায় বস্তি গজিয়েছে।

সারা ভারতে বেশিরভাগ বস্তিই অননুমোদিত। বেশিরভাগেই পায়খানা নেই। ঢাকা নর্দমা আছে মাত্র ৯ শতাংশে। এসব বস্তির উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অতীব কম। বস্তি উন্নয়নের বাজেটে ক্রমাগত ছাঁটাই করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৯৮-৯৯ সালে এজন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩২৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। ২০০২-০৩ সালে বরাদ্দ ৩০৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বরাদ্দ যা হয় তা কেন্দ্র দেয় না। ২০০০-০১ সালে বিজেপি বস্তি উন্নয়নে বাস্তবে দিয়েছে ২২২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। বাজপেয়ীজির সুখের সুবাতাস বস্তিতে ঢোকেনি। তা বইছে একচেটিয়া পুঁজির আঙিনায়। (তথ্যসূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্, ২৯-৩-০৪)

রাজা আসছেন কুইলাপালে? থুড়ি, আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সুদূর রাজধানী কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের কুইলাপালে সফরে আসবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। উদ্দেশ্য — আদিবাসী ছাত্রদের একটি হোস্টেল উদ্বোধন। দিন ঠিক হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। ২০ তারিখ থেকে তিনদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের জেলাশাসকরা তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন — মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো করতে হবে! তিন জেলার সমস্ত পুলিশ দিয়েও কি তা করা সম্ভব! অতএব র‍্যাফ, আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের দরকার — বি এস এফ জোয়ানরা তো আছেই। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই দেখা গেল লাঠি হাতে পুলিশের ভ্যান, লাল পেট্রল কার, মারুতি, ট্যাক্সি, অ্যাম্বুলেন্স, টাটাসুমো, টয়োটা, সাদা কালো অ্যাম্বাসাডার —একেবারে পিঁপড়ের সারির মতো লাইন দিয়ে রিহার্সালে চলেছে। সবার পিছনে কালো ফেট্টি মাথায় র‍্যাফ বাহিনীর নতুন নতুন মোটর সাইকেল। সমস্ত মোড়ে, গঞ্জে আধ কিমি অন্তর পুলিশি জমায়েত। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগের দিনের প্রকৃতি দেখে মনে হয় যেন একটু পরেই তাঁর গাড়ির সাইরেন শোনা যাবে, যেন রাজা বা রাজপুত্র আসছেন।

আগেই খবর ছিল মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে ট্রেন থেকে নেমে বাঁকুড়া হয়ে মোট ১২০ কিমি পথ অতিক্রম করবেন। কুইলাপালে কাজ সেরেই সঙ্গে সঙ্গে আবার দুর্গাপুর হয়েই কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

২৩ তারিখ সকাল থেকে দেখা গেল রাস্তায় ১০-১৫ হাত অন্তর পুলিশ। বাঁকুড়া সদর থেকে ৩ কিমি দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর এক্তেশ্বর ব্রিজ — তার তলায় পজিসন নিয়েছে পুলিশ। জোড়পুল, সাঁকো, সেতু, বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়, জঙ্গল এলাকায় ঘনঘন পুলিশ। শুনুকপাহাড়ী হাটে যাওয়ার রাস্তায় দুইধারে বাঁশের ব্যারিকেড। তার প্রতি খুঁটিতে একজন করে রাইফেলধারী পুলিশ। পুরো রাস্তা ধরে পুলিশের লাইন। ফাঁকা শুনশান রাস্তায় বেচারারা সঙ্গে জলের বোতল নিতে ভুলে গেলে একটু জল পাবার উপায় পর্যন্ত ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে আপ-ডাউন সমস্ত গাড়ি বন্ধ। তবে পথ অবরোধ নয়। তাই এতে শিল্পায়ন আটকাবেনা, পুঁজিও পালাবে না। যাত্রীদের হেনস্থার শেষ নেই। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার মরশুম হওয়া সত্ত্বেও খাতড়া, রানীবাঁধ এলাকায় সমস্ত স্কুল তিন-চারদিন ধরে দখল করে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছিল।

এরোপ্লেনে উড়ে এলে এতসবের দরকার হতো না — বললেন এক পথচারী। মুহূর্তে অন্যজনের উত্তর — মশাই, সামনে লোকসভা নির্বাচন। দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের কেন্দ্রগুলিতে কর্মীদের চাঙ্গা করবে কী দিয়ে। এরোপ্লেনে এলে কি এটা করা যেত? উনি রথ দেখা এবং কলা বেচা — দুটোই একসাথে সারতে চান। খরচের প্রশ্ন তোলায় তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, — কেন, জনগণের ট্যাক তো আছে, যা খরচ হবে দেবে গৌরী সেন। যেখানে টাকার অভাবে সরকার হাঁস- মুরগি, গোরু-বাছুর, ভেড়া-শুয়োরের ওপর ট্যাক্স বসাচ্ছে, মরা মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স চাইছে — সেখানে টাকার কী বিপুল অপব্যয়! তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেল প্রবীণ মানুষটির গলায়।

নিরাপত্তার আতিশয্যে মুখ্যমন্ত্রীর পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই রাস্তার দু'পাশে, মোড়ে, গঞ্জে দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। রাস্তায় তাঁর গাড়ি কোনমতে দাঁড় করানো যাবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ পুষ্পস্তবকও দিতে পারবেন না, এমনকী সি পি এমের বড় নেতা হলেও নয়। এমনই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী।

এত কিছু বর্ণনার একটিই কারণ, তাহল, কুইলাপালে একটি আদিবাসী হোস্টেল উদ্বোধন করতে গিয়ে অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির নেতাদের মতো মুখ্যমন্ত্রী যে বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে এলেন, তাতে আরও কয়েকটি স্কুল বাড়ি, হোস্টেল তৈরি করা যেত না কি? মুখ্যমন্ত্রীর একদিনের সফরে যদি গরিব মানুষের ট্যাক্সের টাকার এমন বিপুল অপব্যয় হয়, তবে ৩৬৫ দিনে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! সরকার যে অর্থসঙ্কটের কথা অহরহ রাজ্যের মানুষকে শোনায় তা কি সত্যি? আর মুখ্যমন্ত্রী যে মাঝে মধ্যেই সরকারি অনুষ্ঠানে ব্যয়-সঙ্কোচের আহ্বান জানান তাও কতখানি আন্তরিক?

বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সপ্তাহ পালিত

এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২৩-২৯ মার্চ বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সপ্তাহ পালনের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে রাজ্যের শতাধিক স্থানে ২৩ মার্চ শহীদ ভগৎ সিং দিবসে ছবিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান ও ভগৎ সিং-এর জীবন সংগ্রাম এবং সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বিষয়ে সপ্তাহ জুড়ে অসংখ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২৮ মার্চ বেকারি বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেকারদের চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, যুব সমাজকে বিপথগামী করতে মদ সহ মাদকদ্রব্যের ঢালাও প্রসার এবং নানান প্রলোভন দিয়ে যুব সমাজের একাংশকে ভোটের কাজে ব্যবহার করার তীব্র নিন্দা করা হয়।

বিশ্ব ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহে ডেপুটেশন

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, সিকিউরিটি বৃদ্ধি, লো-ভোল্টেজ সহ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে অ্যাবেকার আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৮ মার্চ হুগলির শ্রীরামপুরে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং মণিমোহন ঘোষ, মহিউদ্দিন মোল্লা, শীতাংশু তপাদার ও তপন চৌধুরী। বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ইন্দাস, ইন্দপুর, সিমলাপাল, খাতড়া, ওন্দা, ছাতনা, শালতোড়ায় অনুরূপ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, বলরাম পাল, কমলাকান্ত কর্মকার, সুধাংশু রায়, শেখ ইদ্রিস, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব গোস্বামী, অশোক কুচলান প্রমুখ। বিদ্যুৎ বিলের আতঙ্কে রামপুরহাটে জনৈক প্রফুল্ল সরকার হৃদরোগে মারা যান। এর প্রতিবাদে এদিন এখানে কালো ব্যাজ ধারণ ও ধিক্কার সভা করা হয়।

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের
বিক্ষোভ সমাবেশ

বি পি টি এ, এস টি ই এ, হেড মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ ৬টি শিক্ষক সংগঠন, জেপিএ, গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) সহ ১৪টি সরকারি ও আধা সরকারি সংগঠনের 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ' মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৬ মার্চ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের আহ্বায়ক ফটিক দে। বক্তব্য রাখেন কার্তিক সাহা, তপন চক্রবর্তী, অশোক মাইতি, বিমল জানা, সাধন রায়, মনোজ চক্রবর্তী, মৃগেন মাইতি, রঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ।

টু-হুইলার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

হাইকোর্টের রায় মেনে রাজ্য সরকার কর্তৃক বেআইনিভাবে আদায়ীকৃত 'জীবনকালীন করে'র টাকা অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়ার দাবি জানালেন পশ্চিমবঙ্গ টু-হুইলার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। দাবি না মানলে রাজ্যের সমস্ত মোটর ভেহিকেলস্ দপ্তর ঘেরাও এবং প্রয়োজনে লাগাতার ঘেরাও চলবে বলে ৩১ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net